আহমদ ছফার উপন্যাস অলাতচক্র: মুক্তিযুদ্ধের ভিন্নতর পাঠ

মোস্তাফা কামাল আরিফ[১]

সারসংক্ষেপ

আহমদ ছফার অলাতচক্র উপন্যাসটি মুক্তিযুদ্ধের সময় শরণার্থী জীবন, রাজনৈতিক টানাপোড়েন এবং মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের এক অসাধারণ চিত্রায়ন। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র দানিয়েলের জবানিতে লেখক যুদ্ধকালীন বাস্তবতার গভীর বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন। তিনি নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে শরণার্থীদের জীবন, তাদের দুঃখ-কষ্ট, কলকাতার মানুষের প্রতিক্রিয়া এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের সীমাবদ্ধতা তুলে ধরেছেন। উপন্যাসে বাঙালি জাতির সংগ্রামের সাথে সাথে উঠে এসেছে নকশাল আন্দোলন, চীনপন্থী কমিউনিস্টদের ভ্রান্তি, প্রবাসী সরকারের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং যুদ্ধ পরিচালনার সমন্বয়হীনতা। ছফা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে আবেগময় কাহিনির বাইরে এনে এর রাজনৈতিক ও সামাজিক দিকগুলো ব্যাখ্যা করেছেন। পাশাপাশি, তিনি একটি নীরব প্রেমের গল্পের মধ্যে জাতিগত বঞ্চনার দীর্ঘ ইতিহাস এবং ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা প্রকাশ করেছেন। ছফার বর্ণনায় দেখা যায় মুক্তিযুদ্ধের শেকড় থেকে রাজনৈতিক সংগ্রামের গভীরতা এবং যুদ্ধ-পরবর্তী সম্ভাব্য ফলাফলের অনিশ্চয়তা। উপন্যাসটি মনোযোগী পাঠকের জন্য এক চিন্তাশীল যাত্রা, যা শুধু মুক্তিযুদ্ধ নয়, বরং ইতিহাস এবং ভবিষ্যতের দিকে নতুন করে তাকানোর আহ্বান জানায়।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ: মুক্তিযুদ্ধ, শরনার্থী, স্বাধীনতা ও স্বপ্নভঙ্গ, *অলাতচক্র*।

আহমদ ছফা জীবিতকালে বারবার আলোচিত, সমালোচিত হয়েছেন তাঁর আপসহীন ব্যক্তিত্ব, প্রথাবিরোধী মনোভাব, সত্যনিষ্ঠা এবং নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির জন্য। মুক্তিযুদ্ধকালীন এপ্রিলের মাঝামাঝিতে কলকাতা চলে যান, সে সময়ের বাস্তবচিত্র জনসম্মুখে তুলে ধরার তাগিদ অনুভব করেছিলেন তিনি। যুদ্ধ একটিদেশ, জাতি, দেশের প্রতিটি মানুষের জীবনের আমূল পরিবর্তন ঘটায়। তাছাড়া মানুষের মূল্যবোধ, জীবনচেতনা, সমস্ত বিষয়ের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। আহমদ ছফা সে বদলে যাওয়া মানুষের মনস্তাত্ত্বিক নানা বিবর্তন, শরণার্থী জীবন নিয়ে রচনা করেছেন তাঁর *অলাতচক্র* (১৯৯৩) উপন্যাসটি।

> অলাতচক্রের ভাবগত অর্থ হচ্ছে জলন্ত অঙ্গার বা জলন্ত কাঠ, বেগে ঘোরালো যে চক্রাকার আগুনের রেখা দেখা যায়, সেই চক্রাকার রেখাই হলো *অলাতচক্র*।[১]

শরণার্থী শিবিরে যারা ছিলেন এবং কলকাতা শহরে ছায়ার মতো জীবনযাপন করছিলেন তাদের জীবনও এ আগুনের রেখার মতো চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান ছিল।

আহমদ ছফা লেখনীর ক্ষেত্রে মিথ্যার বা ভনিতার আশ্রয় নেননি। নিজের ভালোবাসা, দুর্বলতা, অসহায়ত্ব এবং মুক্তিযুদ্ধকালীন সুযোগসন্ধানী কিছু মানুষের প্রকৃত স্বরূপ তাঁর *অলাতচক্র* উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। উপন্যাসটি তাঁর জীবনের অবিচ্ছেদ্য কাহিনি নিয়ে রচনা করেছেন। *অলাতচক্রের* মূল চরিত্র দানিয়েল মূলত ছফা নিজেই। উপন্যাসটির বয়ান পেশ করা হয়েছে অন্যতম মূল চরিত্র দানিয়েলের জবানে। এই বয়ান যাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত তাঁর নাম তায়েবা। আহমদ ছফার ভ্রাতুষ্পুত্র ও জীবনীকার নূরুল আনোয়ার লিখেছেন:

> ১৯৮৫ সালে নিপুন পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠে প্রধান চরিত্র দুটির নাম ছিল আহমদ ও তরু। তবে ১৯৯৩ সালে উপন্যাসটি গ্রন্থাগারে প্রকাশের প্রাক্কালে পরিমার্জন করার সময় তিনি সেটা পরিবর্তন করে দেন।[২]

উপন্যাসের পটভূমি বা স্থান কলকাতা শহর, সময় ১৯৭১ খ্রি.। যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে তা আবর্তিত হচ্ছে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বাংলাদেশে সংঘটিত মুক্তিযুদ্ধ। সেই সময়ে বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে কলকাতা শহরে আশ্রয়

[1] প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা।

নেয়া শরণার্থীদের উদ্বাস্তু জীবন, কলকাতার মানুষ ও পরিবেশ পরিস্থিতির ঘটনাই উপজীব্য হিসেবে উঠে এসেছে *অলাতচক্র* উপন্যাসে।

দানিয়েল চরিত্রের মধ্য দিয়ে ছফা নিজেই বলতে চেয়েছেন:

> আমার যুদ্ধে যাওয়া হয়নি। যুদ্ধকে ভয় করি বলে নয়। আমাদেরদেশের যে সকল মানুষের হাতে যুদ্ধের দায়-দায়িত্ব, তাঁরা আমাকে ট্রেনিং সেক্টরে পাঠাবার যথেষ্ট উপযুক্ত বিবেচনা করতে পারেননি। আমি তিন তিনবার চেষ্টা করেছি। প্রতিবারই মহাপুরুষদের দৃষ্টি আমার উপর পড়েছে। অবশ্য আমাকে বুঝিয়েছে, আপনি যুদ্ধে যাবেন কেন? আপনার মত ক্রিয়েটিভ মানুষের ইউজফুল কতকিছু করবার আছে। যান কলকাতা যান, সেই থেকে কলকাতা আছি, হাঁটতে বসতে চলতে ফিরতে মনে হয়, আমি শূন্যের ওপর ভেসে বেড়াচ্ছি।[৩]

ব্যাবিলনে নির্বাসিত ইহুদি জাতির মধ্যে দানিয়েল নামে একজন ধুরন্ধর ব্যক্তি ছিলেন। ১৯৭১ সালে কলকাতায় উপনীত বাঙালি মুসলমানদের মধ্যেও একজন বুদ্ধিজীবী আছেন যাঁর নাম দানিয়েল। দানিয়েলের জবানীতেই *অলাতচক্র* উপন্যাস চলছে। দানিয়েল বলেছেন:

> অস্বীকার করার, উপায় নেই, বাংলাদেশে একটি মুক্তিযুদ্ধে চলছে এবং এই যুদ্ধের কারণেই কলকাতা মহানগরীর নাভিশ্বাস উঠছে। ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধেও জন্য সাজ সাজ রব উঠছে। আমি সেই বিরাট কর্মকাণ্ডের একটা ছিটকে পড়া অংশ।[৪]

তাঁর কথা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি ধুরন্ধর সত্যব্রতবাবুর সঙ্গে। সত্যব্রত ব্রত করেছেন সত্য বলবেনই:

> আমরা আশা করেছিলাম, আপনারা অন্যরকমের একটা ঘটনা ঘটাবেন। মার্চ মাসের প্রাথমিক দিনগুলোতে পশ্চিম-বাংলার হাজার হাজার ছেলে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে বাংলাদেশে গিয়ে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল। আপনারা যুদ্ধের সমস্ত মাঠটা পাকিস্তানি সৈন্যদের ছেড়ে দিয়ে একেবারে চূড়ান্ত নাজুক অবস্থায় ইন্দিরা সরকারের অতিথি হয়ে ভারতে চলে এলেন, এটা আমরা আশা করিনি।[৫]

সত্যব্রত আরও বললেন:

> আপনাদের দেশ এবং জনগণের ভাগ্য এখন আন্তর্জাতিক চক্রান্তের মধ্যে আটকা পড়ে গেছে। দুনিয়ার সমস্ত দেশ চাইবে আপনাদের উপলক্ষ্য করে দাবায় নিজের চালটি দিতে। মাঝখানে আপনারা চিড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে যাবেন। আমার মনে হয় কি জানেন, আপনাদের ঐ শেখ মুজিব মানুষটি হাড়ে হাড়ে সুবিধেবাদী অথবা বোকা। কি সুবর্ণ সুযোগই না আপনাদের হাতে ছিল।[৬]

মুক্তিযুদ্ধকালীন উদ্বাস্তু জীবন পর্যবেক্ষণ করে সেখানকার পরিবেশ পরিস্থিতি ও মানুষজনের আচার আচরণ তুলে ধরেন। কলকাতার সেই সময়ের বাজার ব্যবস্থাপনার চিত্রও দেখতে পাই । শেয়ালদার মোড়ে মোড়ে খরচে সস্তা সবচে ঠুনকো স্পঞ্জের স্যান্ডেলের নাম জয়বাংলা স্যান্ডেল। এক হপ্তার মধ্যে যে গেঞ্জি শরীরের মায়া ত্যাগ করে তার নাম জয়বাংলা গেঞ্জি। জয়বাংলা সাবান, জয়বাংলা ছাতা এতকিছু জিনিস বাজারে ছেড়েছে কলকাতার ব্যবসায়ীরা এমনকি সে সময় মহামারি আকারে 'চোখ উঠা রোগ' প্রকোপটির নামও হয়ে যায় জয় বাংলা।

উপন্যাসে দানিয়েল সংকটময় জীবনের মুহূর্তে প্রত্যক্ষ করে কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির হালচালও। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে সেখানেও। সেখানকার রাজনীতির ক্ষমতাসীন দল কংগ্রেস ও বাম রাজনীতির দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে রূপ নেয়। এক সকালে সেখানকার এক মার্ক্সবাদী ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিএম) কর্মী মজহারের সাথে দেখা হলে তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে :

> আপনারা বাংলাদেশের মানুষেরা বেশ আছেন, গোটা কলকাতা শহরে একেকজন ধর্মের ষাঁড়ের মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আপনারা তো ইন্দিরা সরকারের অতিথি হিসেবে দিব্যি আছেন। এদিকে ইন্দিরাজি আমাদের কোন হাল করেছেন, সেটার কিছু খোঁজ-খবর রাখেন, গতকাল এ পাড়ায় আমাদের পার্টির যত কর্মী ছিল সবাইকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে।[৭]

কলকাতায় যাদের সঙ্গে জীবনাচার, চলাফেরা তাদের বক্তব্য, চিন্তভাবনার বহিঃপ্রকাশ দিনকে দিন যেন তার কাছে জটিল হতে শুরু করে ঘরের টুকরো টুকরো আলাপ কানে আসছে। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, হিন্দু, মুসলমান, চিন, রাশিয়া, আমেরিকা, বাঙালি, অবাঙালি, শেখ মুজিব, ভাসানী, ইন্দিরা গান্ধী, কংগ্রেস, সিপিএম এ সকল বিষয় আলোচনা বার বার ঘুরে ঘুরে আসছে।

মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে ভারত সরকার যেমন তার হিসাব নিকেশ করছে তেমনি পাকিস্তানের নেতারাও সব কিছুকে আমলে নিয়ে নিজেদের অখণ্ডতাকে বজায় রাখার জন্য তৎপর হচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এদেশের নেতাদের

অনেকের ভূমিকাও প্রশ্নবিদ্ধ ছিল। আহমদ ছফা সেদিকেও নজর দিয়েছেন। এ উপন্যাস রচনাকালে আহমদ ছফা কোন ভাবাবেগের আশ্রয় নেননি, আর এজন্যই হয়তো নেতাদের ভূমিকার কথা অবলীলায় বলে যেতে পেরেছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মাওলানা ভাসানীদের, কলকাতার থিয়েটার রোডে বসবাসকারী প্রবাসী সরকারের মন্ত্রীরাও বাদ যাননি সমালোচনার হাত থেকে।

খন্দকার মোশতাক যুদ্ধ চলার সময়েই যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমে পাকিস্তানের সাথে আপসে যেতে চান। এছাড়া তাজউদ্দীনের মতো নেতাকে রেখে শেখ মনির নির্দেশ শোনার পরামর্শ যথাযথ ছিল না। তার ইঙ্গিত দেন ছফা। আবার ভারতে ট্রেনিং দিতে আসা আজহার বৌবাজারের হোস্টেলে আলাপকালে বলে:

> দেখলাম ঘুরে ঘুরে প্রিন্সেপ স্ট্রিট, থিয়েটার রোডের সাহেবরা খেয়েদেয়ে তোফা আরামে আছেন। অনেককে তো চেনাই যায় না চেহারায় চেকনাই লেগেছে।[৮]

একদিকে যখন প্রতিটি ক্যাম্পে মানুষগুলোর এমন শোচনীয় অবস্থা তখনই অন্যদিকে বাংলাদেশের কিছু সুবিধাবাদী নেতকার্মীদের বেপরোয়া জীবনযাপন।

তাদের খাওয়া-দাওয়া, ফূর্তি করা, কোনো কিছুরই অভাব নেই, আরেক দল বাংলাদেশের ব্যাংক থেকে সোনা লুট করে কলকাতায় এসে আশ্রয় নিয়েছে, কলকাতা শহরের সবগুলো বার, নাইট ক্লাবে খোঁজ করে দেখুন। দেখা যায় ঝাঁকে ঝাঁকে বাংলাদেশের মানুষ দুহাতে পয়সা ওড়াচ্ছে।

দেশের এমন সংকটকালেও এইসব বিকৃত মানসিকতার মানুষগুলো নির্বিচারে তাদের জীবন কাটাচ্ছে। শরণার্থী শিবিরগুলোর অবর্ণনীয় কষ্ট, মানুষের মৃত্যু, অসহায় মানুষগুলোর আর্তনাদ তাদের মননে পৌঁছায়নি। বরং তারা ভারত সরকারের অতিথি হয়ে দিন কাটাচ্ছে আর পয়সা ওড়াচ্ছে। মুক্তিকামী মানুষগুলো থিয়েটার রোডে অবস্থিত নেতাকর্মীদের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে সে সময় কলকাতার বাসিন্দাদের মনে বাংলাদেশের যুদ্ধ এবং শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক দর্শনগত আলোচনা তুঙ্গে ছিল। অর্চনা দানিয়েলের কলকাতার বন্ধু। লেখালেখির সূত্রে তার সঙ্গে পরিচয়।

অর্চনার ফ্রান্স ফেরত দাদা প্রমোদ বাবু বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে তার মতামত প্রকাশ করে:

> মুজিব লোকটা কেমন, তাঁর রাজনৈতিক দর্শন কী সে ব্যাপারে স্পষ্ট করে কেউ কিছু বলতে পারেননি। কিন্তু একটা বিষয় দিনের আলোর মতো পরিষ্কার, মানুষটার ভেতরে নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে। নইলে তাঁর ডাকে এতগুলো মানুষ বেরিয়ে এল কেমন করে। আমি টিভিতে মুজিবের অনেকগুলো জনসভার ছবি দেখেছি। দেখার সময় শরীরের পশম সোঁজা হয়ে গিয়েছিলো। এরকম মারমুখী মানুষের ঢল আমি কোথাও দেখিনি।[৯]

মুক্তিযুদ্ধের ওপর লেখা বাংলাদেশের প্রথম বই 'জাগ্রত বাংলাদেশ' এর উল্লেখ পাওয়া যায় *অলাতচক্র* উপন্যাসে। বইটি প্রকাশিত হয়েছিল চিত্তরঞ্জণ দাসের প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'মুক্তধারা' থেকে এবং এর লেখক ছিলেন দানিয়েল তথা আহমদ ছফা নিজেই।

দানিয়েল চরিত্রটি হিব্রু ভাষার। কিতাবুল মোকাদ্দস অনুসারে এর অর্থ 'আল্লাহ আমার বিচারক'। বাঙালি মুসলমানও ভাবে-দুঃখে কিছুটা ইহুদি ভাবাপন্ন। দানিয়েল কবুল করেন সত্যব্রতবাবুর কথাটা মিথ্যে নয়:

> উনিশ শ' আটচল্লিশ থেকে সত্তর পর্যন্ত এই জাতি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। আর চূড়ান্ত মুহূর্তটিতে আমাদের সবাইকে দেশ ও গ্রাম ছেড়ে ভারতে চলে আসতে হয়েছে। আমাদের হাতে সময় ছিল, সুযোগ ছিল। কোলাহল আর চিৎকার করেই আমরা সুযোগ এবং সময়ের অপব্যবহার করেছি। পাকিস্তানের কর্তাদের আমরা আমাদের বোকা বানাতে সুযোগ দিয়েছি। তারা সৈন্য এনে ক্যান্টনম্যান্টগুলো ভরিয়ে ফেলেছে এবং সুযোগ বুঝে পাকিস্তানি সৈন্য আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আমাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। আমরা আমাদের যুদ্ধটাকে কাঁধে বয়ে নিয়ে ভারতে চলে এসেছি। হয়ত যুদ্ধ একদিন শেষ হবে, তারপর কি হবে? আমাদের যুদ্ধটা ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কে জানে কি আছে ভবিষ্যতে।[১০]

আখ্যানের একেবারে গোড়ায় আমরা দেখতে পাই দানিয়েল হাসপাতাল যাচ্ছেন, কলকাতার পিজি হাসপাতালে বাংলাদেশের একজন তরুণী ভর্তি হয়েছেন। দানিয়েল যাচ্ছেন তাঁর খোঁজে। তরুণীর নাম তায়েবা। বয়স সাতাশ। তাঁর পরিবারের অন্তঃপুর পর্যন্ত রবীন্দ্রসঙ্গীত ও কম্যুনিস্ট পার্টির দৌড়। তায়েবাকে হাসপাতালে তুলেছেন যিনি তিনি ঐতিহাসিক ব্যক্তি বটে।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী সাহিত্যপত্র পরিচয় সম্পাদক সাহিত্যিক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। অসুস্থ তায়েব াকে খাওয়াবে বলে দানিয়েল যাঁর কাছে একটু ভাত আর ছোট মাছের আবদার করতে যাবেন কাল সকালে, ঘুম থেকে ওঠে, সেই প্রাতঃস্মরণীয়ের নাম কাকাবাবু, ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মুজাফ্ফর আহমদ, প্রকাশ কমরেড মুজাফ্ফর আহমদ; স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে কে এই তায়েবা? দানিয়েলের ভাষ্য মোতাবেক:

> তায়েবা ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনের সময় আসাদ হত্যার দিনে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে পত্র পত্রিকার আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল। সবগুলো কাগজে পুরো পৃষ্ঠা ছবি ছাপা হয়েছিল। আজ কলকাতার পিজি হাসপাতালে নিঃশব্দে মৃত্যুর প্রহর গুণছে আর অলীক রওশন আরার ভাবমূর্তি জনমনে অক্ষয় আসন দখল করিয়াছে।[১১]

কাহিনি বর্ণনার যে প্রচলিত রীতি রয়েছে আহমদ ছফা তার এ উপন্যাসে থেকেবেরিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন। কাহিনির সরলরৈখিক বয়ান এখানে নেই। উপন্যাসে আমরা যেভাবে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পড়তে চাই,কোন ঘটনার খুঁটিনাটি সবকিছু জানতে চাই, অলাতচক্র পড়তে গিয়ে আমাদের এ অভিজ্ঞতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে উপন্যাসের ভেতর কিন্তু যার কোনটিই বিস্তৃতির দিকে যায়নি। বরং সবগুলো ঘটনার ভেতর দিয়ে উপন্যাসের যে মূল সুর- যুদ্ধ প্রভাবিত মানুষগুলোর জীবন-যন্ত্রণা এবং মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্নভঙ্গ তা-ই ফুটে উঠেছে।

তবে এ অবস্থাও আর বেশি দিন চলে না। বেতারে এম আর আখতার মুকুলের চরমপত্র পাঠের মতই যেন যুদ্ধে নতুন মোড় আসে। ভারতসহ কয়েকটি দেশ বাংলাদেশের পক্ষে অবস্থান নিলে ভারত সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং সেই সাথে দেশের ভেতরে গেরিলা বাহিনীর উত্থান যুদ্ধকে গতিশীল করে তোলে। তবে যুদ্ধের ফলাফল বা ইতিহাসের কথা উঠলে এ যুদ্ধ প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার আশংকা জাগে। বাঙালির দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রাম, ত্যাগের বিষয়গুলো সামনে চলে আসে। চলে আসে ভবিষ্যতের ইতিহাসের বিষয়টিও ভারতের পাকিস্তানের সাজ সাজ রব চলছে:

> বাংলাদেশ ভারতের নৌকায় পা রেখেছেন। বাঙ্গালি জাতির স্বাধীনতার জন্য বাংলাদেশের জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ভারত একটি যুদ্ধ ঘাড়ে তুলে নিচ্ছে। ভারতের স্বার্থ থাকে থাকুক তারপরেও একটি প্রশ্ন যখন মন-ফুঁড়ে তেড়ে ওঠে, নিজের কাছেই নিজে বেসামাল হয়ে পড়ি। বাংলাদেশ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ১৯৪৮ থেকেই সংগ্রাম করে আসছে। আসন্ন ভারত পাকিস্তান যুদ্ধটিই কি বাঙালি জাতির রক্তাক্ত সংগ্রামের একমাত্র ফলাফল।[১২]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অধিকাংশ উপন্যাসের ক্ষেত্রে যা দেখা যায় তা হচ্ছে পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী আর দেশের রাজাকার আলবদর কর্তৃক সাধারণ মানুষের সরাসরি আক্রান্ত হওয়া বা যুদ্ধ জড়িয়ে পড়া এবং যুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে বাঙালির বিজয় লাভ।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বাস্তব অবস্থার নির্মোহ বয়ান ও ভিন্নতর পাঠ আহমদ ছফা আমাদের উপহার দিয়েছেন।

তায়েবাকে বাংলাদেশের নিশান বানিয়েছেন। আহমদ ছফা তার পবিত্রতার তুলনা পরিষ্কার করার খাতিরে ১৯৭১ সালে সৃষ্ট কল্পকন্যা রওশন আরার কথাও তুলেছেন। দানিয়েলের দুঃখ, কল্পকন্যা রওশন আরার জন্ম প্রক্রিয়ায় তার নিজেরও একটা ছোটখাটো ভূমিকা আছে। আগরতলার সাংবাদিক বিকচ চৌধুরীর বিপুল কল্পনাশক্তির ঔরসে রওশন আবার জন্ম। বিকচ বাবু পয়লা খবরটার খসড়া এভাবে লিখেছেন, ফুলজান নামের এক যুবতী বুকে মাইন বেঁধে পাকিস্তানি সৈন্যের একটা আস্ত ট্যাঙ্ক উড়িয়ে দিয়েছে। দানিয়েল আপত্তি তুললেন:

> ধর নাম নির্বাচনের বিষয়টি। তুমি বলেছ ফুলজান, এই নামটি একেবারেই চলতে পারে না। বাঙালি মুসলমানের নাম সম্পর্কে তোমার ধারণা নেই। তাই ফুলজান শব্দটি তোমার কলমের মুখে উঠে এসেছে। বাংলাদেশে ফুলজান যাদের নাম, তারা বড়জোর হাঁড়ি- পাতিল ঘষে, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে ট্যাঙ্কের তলায় আত্মহুতি দিতে পারে না। সুতরাং একটা জোতসই নাম দাও, যাতে শুনলে মানুষের মনে একটা সম্ভ্রমের ভাব জাগবে। রওশন আরা নামটি মন্দ কি! বঙ্কিম তাঁর উপন্যাসে এই নামটি বেছে নিয়েছিলেন। নামের তো একটি মাহাত্ম আছেই রওশন আরা নাম যে মেয়ের সে যেমন হৃদয়াবেগের আহ্বানে সাড়া দিয়ে জয়সিংদের ভালো বাসতে পারে, তেমনি দেশজননীর প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ট্যাংকের তলায় আত্মহুতিও দিতে পারে। তারপর গল্পের নিয়মেই বাকি ব্যাপারগুলো বেরিয়ে এসেছিল। তার বাড়ী নাটোর। তার বাবা পুলিশ অফিসার। সে ইডেনে পড়ত এবং শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মীয়া ইত্যাদি।[১৩]

আকাশবাণীর দেবদুলালবাবুর কল্যাণে রওশন আরার পরিচিতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। রওশন আরার আত্মীয়স্বজন রেডিওতে সাজানো সাক্ষাৎকার দিতে আরম্ভ করেছে। দানিয়েলের দায়বোধ এরকম:

> যুদ্ধের প্রথম বলিই তো সত্য। কিন্তু আমি বা বিকচ ইচ্ছা করলেই রওশন আরাকে আবার নিরস্তিত্ব করতে পারি না। আমরা যদি হলপ করেও বলি, না ঘটনাটি সত্য নয়, রওশন আরা বলতে কেউ নেই, সবটাই আমাদের কল্পনা, লোকজন আমাদের পাকিস্তানি স্পাই আখ্যা দিয়ে ফাঁসিতে ঝোলাবার জন্য ছুটে আসবে।[১৪]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিয়োগকাহিনি তায়েবার ভাগে, আর যুদ্ধের তামাশার গল্পটি রওশন আরার। তায়েবা বাংলাদেশের নিশানা বা রূপান্তর। অন্তত দানিয়েল এ দৃষ্টিতে দেখছেন:

> একটি নারী দিনে দিনে নীরবে নিভৃতে কলকাতার পিজি হাসপাতালে একটি কেবিনে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। আমরা জানতাম সে মারা যাবেই। মারা যাবার জন্যই সে কলকাতা এসেছে। যুদ্ধ দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসছে। আমি ধরে নিয়েছিলাম, বাংলাদেশে স্বাধীনতা অবশ্যম্ভাবী, আর তায়েবাকে এখানে রেখে যেতে হবে। তায়েবা অত্যন্ত শান্তভাবে নিজেকে প্রস্তুত করে নিচ্ছিল।[১৫]

রেজোয়ানের আত্মহত্যার জন্য দানিয়েল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে দায়ী করেছিলেন, বাংলাদেশের যুদ্ধটা না লাগলে হয়তো ছেলেটাকে এমন অকালে মরতে হতো না।

কিছুদিন আগে রেজোয়ানদের আড্ডায় কুমিল্লা থেকে মজিদ বলে আরেকটি ছেলে আসে। রেজোয়ানেরা থাকত রিপন স্ট্রিটে। মজিদ আর রেজোয়ান দু'জনেই কুমিল্লার কান্দিরপাড় এলাকার একই পাড়ার ছেলে। মজিদ কলকাতা এসে সকলের কাছে রটিয়ে দেয় যে, রেজোয়ানের যে বোনটি উমেন্স কলেজের প্রিন্সিপাল সে একজন পাকিস্তানি মেজরকে বিয়ে করে ফেলেছে। সংবাদটা পাওয়ার পর রেজোয়ান অনেক চেষ্টা করেও কেউ তাকে কিছু খাওয়াতে পারেনি। অবশেষে রাতে ঘুমের ঔষধ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। তার মাথার কাছে চিরকুটে লেখা ছিল:

> বড় আপা, যাকে আমি বিশ্বাস করতাম সবচেয়ে বেশি, একজন পাকিস্তানি মেজরের স্ত্রী হিসাবে তারই সঙ্গে একই বিছানায় ঘুমাচ্ছে। এ কথা আমি চিন্তা করতে পারি না। দেশে থাকলে বড় আপা এবং মেজরকে হত্যা করে প্রতিশোধ নিতাম।[১৬]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন পায়ে হেঁটে কলকাতা মহানগরীতে গিয়ে হাজির হতে হলো এবং বাঙালি মুসলমানের জাতীয় যুদ্ধ কেন ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের একটা ছিটকে পড়া অংশ হয়ে উঠতে বাধ্য হলো? দায়িয়েলের এ দুটো প্রশ্নের রূপক বটে তায়েবার অসুখ ও মৃত্যু। তায়েবার মত টগবগে তরুণীকে কেন কলকাতায় পিজি হাসপাতালে উঠতে হলো? আর শেষ পর্যন্ত ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট অন্ধকারের মধ্যে আত্মীয়-বান্ধব বর্জিত রাতে তাকেও কেন আত্মবিসর্জন দিতে হল? এই দুই প্রশ্নকে এক দেহে লীন করেছেন আহমদ ছফা। এ ঘটনাকে লেখক সলিমুল্লাহ খান মহৎ সাহিত্যের আলামত বলে মানতে চান।

দানিয়েলের বচন:

> আমরা আমাদের যুদ্ধটাকে কাঁধে বয়ে নিয়ে ভারতে চলে এসেছি। হয়তো যুদ্ধ একদিন শেষ হবে। তারপর কি হবে? আমাদের যুদ্ধটা ভারত- পাকিস্তানের যুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার মন বলছে পাকিস্তান হারবে, হারতে বাধ্য। কিন্তু আমরা কি পাব? ইতিহাসের যে গোঁজামিল আমরা বংশপরম্পরা রক্তধারার মধ্য দিয়ে বহন করে চলেছি তার কি কোনো সমাধান হবে।[১৭]

বাংলাবাজারের ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ জয়সিংহ ব্যানার্জি যজমানের মেয়ে সবিতাকে নিয়ে কলকাতায় রেশন তুলেছেন। বলছেন মেয়েটির কোনো অভিভাবক নেই। তাই তাকে পোষার দায়িত্ব তার ঘাড়ে এসে পড়েছে মাত্র। বাংলাবাজারের মিথ রামুর জবানবন্দিতে তার মিথ্যা ধরা পরে। রামু বলেন, শালা বদমাইশ বাউন, মা আর বুন দুইডা ক্যাম্পে কাইন্দা চোখ ফোলাইয়া ফেলাইছে আর হারামজাদা মাইয়াডারে কলকাতার টাউনে আইন্যা মজা করবার লাগছে।

অলাতচক্র রাষ্ট্র ও বাসনার কাহিনিও বটে। এ বাসনার কাহিনি রাষ্ট্রের সকল পর্যায়ে। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের একজন মন্ত্রীকে নিয়ে এ বাসনার ট্রাজেডি একটা প্রহসন হয়ে উঠে। কলকাতা শহরে শ্রমিকশ্রেণির বাসনাপুর বিখ্যাত সোনাগাছি। সেখানে পুলিশের হাতে পড়ে ভদ্রলোককে কবুল করতে হলো তিনি প্রবাসী সরকারের একজন মন্ত্রী বটে।

খোঁজ-খবর করে নিশ্চিন্ত হলেন অফিসার মহোদয়। বকাঝকা করলেন মান্যবর অতিথিকে:

> স্যার কেন মিছিমিছি সোনাগাছির মতো খারাপ জায়গায় গিয়ে না হক ঝুট ঝামেলার মধ্যে পড়বেন আর ভারত সরকারের আতিথেয়তার নিন্দা করবেন। আগেভাগে আমাদের স্মরণ করলেই পারতেন আমরা আপনাকে ভিআইপির উপযুক্ত জায়গায় পাঠিয়ে দিতাম।[১৮]

তায়েবা চরিত্রটির মধ্যে আমরা দেখতে পাই তিনি স্বাধীনতা অন্তপ্রাণ, আলাপ আলোচনায় কথাবার্তায় আমরা দেখি তার মনটি কি রকম কম্পাসের কাঁটার মতো স্বাধীনতার দিকে হেলে থাকে। উনিশশ উনসত্তরের আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে তায়েবা নিজে থেকে উদ্যোগী হয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেছিল।

অসুস্থতার দিন তায়েবা জানাচ্ছেন:

> সারাজীবন আমি আলেয়ার পেছনে ছুটেই কাটিয়ে দিলাম, মা, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব সকলে সুখে হোক দুঃখে হোক একটা অবস্থান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু আমি তো হাওয়ার উপর ভাসছি। তারা হয়তো সুখ পাবে জীবনে, নয়তো দঃখ পাবে, তবু সকলে নিজের নিজের জীবনটি যাপন করবে। কিন্তু আমার কি হবে, আমি কি করলাম? আমি যেন ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমেই গোটা জীবনটা কাটিয়ে দিলাম।[১৯]

দানিয়েলের বন্ধু অর্চনা দেবী, তাঁর এক দূর সম্পর্কীয় দাদা এসেছেন ফ্রান্স থেকে। তিনি এক সময় অনুশীলন দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তারপর নেতাজি সুভাষ বোসের সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি বললেন:

> পরিস্থিতি যে রকমদেখা যাচ্ছে, পাকিস্তান ভেঙ্গে পড়বেই, ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য। [বাংলাদেশ] একটি ভাষাভিত্তিক জাতীয় রাষ্ট্র জন্ম নিতে যাচ্ছে। এ কথা যদি বলি আশা করি অন্যায় হবে না। বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই। তারপর ভারতকে একই সংকটের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। আঞ্চলিক, জাতিগত, ধর্ম এবং ভাষাগত বিচ্ছিন্নতার দায় মেটাতে গিয়ে ভারতবর্ষের কর্তাব্যক্তিদের হিমসিম খেতে হবে। এমনকি ভারতের ঐক্যও বিপন্ন হতে পারে।[২০]

প্রমোদবাবু নামের জ্ঞানীলোকের যুক্তিও অভিন্ন। প্রমোদবাবুর বক্তব্যের সারমর্ম হলো- রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যে সামান্য অধিকার আমার আছে, তা দিয়েই বলতে পারি ভারতবর্ষের ব্যাপারে একজাতিতত্ত্ব এবং দ্বিজাতিতত্ত্ব কোনোটাই খাটে না। আসলে ভারতবর্ষ বহুজাতি এবং বহুভাষার একটি মহাদেশ। উনিশ শ সাতচল্লিশে ধর্মের প্রশ্নটি মুখ্য হয়ে অন্য প্রশ্ন ধামাচাপা দিয়েছিল। আরো একটা কথা নানা অনগ্রসর পশ্চাদপদ জাতি এবং অঞ্চলের পশ্চাদপদ জনগণ তাদের প্রকৃত দাবি তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছিল বলেই আপাত সমাধান হিসেবে ভারত-পাকিস্তান রাষ্ট্র দুটির জন্ম হয়েছিল।

অলাতচক্র নিয়ে অবশ্য আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ভিন্ন বক্তব্য রয়েছে। *আহমদ* ছফার পাঁচটি উপন্যাস গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেন:

> ওঙ্কার এ যেখানে একেকজন ব্যক্তিকে ছফা উত্তীর্ণ করেন বহু মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিতে, ক্রোধের কাছে আত্মসমর্পণ করে অলাতচক্র উপন্যাসে সেখানে একেকজনের টুকরো অংশগুলোকে ছুঁড়ে দিয়ে শিল্পী হিসেবে নিজের মাপটিকেই কি খাটো করে ফেললেন না ?[২১]

জবাবে সলিমুল্লাহ খান তাঁর আহমদ ছফা সঞ্জীবনী গ্রন্থে বলেন:

> আমার বরং মনে হয় আখতারুজ্জামান ইলিয়াস নিজেই বিক্ষুব্ধ। মীর মশাররফ হোসেনের বিষাদ-সিন্ধুর সঙ্গে যদি তিনি আহমদ ছফার অলাতচক্রের তুলনা দিতেন, এটা যোগ্য কাজ করতেন।

বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্বের সবচেয়ে বড় অর্জন মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন কলকাতার ঘটনপ্রবাহকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে আবেগবর্জিত হয়ে আহমদ ছফা বিশ্লেষণ করেছেন এবং মুক্তিযুদ্ধের ভিন্নতর পাঠ উপহার দিয়েছেন।

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে ব্যতিক্রমী কথাকার আহমদ ছফা সম্পর্কে অগ্রজ কথাকার হাসান আজিজুল হকের বক্তব্য:

> তির্যক ভয়াবহ বাস্তবতার ঝিলিক শানিত কলম আর দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলতে-থাকা মন থেকে কিভাবে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে পারে তা-ও তো আমরা আহমদ ছফার লেখা থেকেই লক্ষ্য করি। এঁদেরকেই আমি দু-একজন ব্যতিক্রমী লেখক বলেছি। (দুষ্পাঠ্য কররেখা: আমাদের সাহিত্য)[২২]

তথ্যনির্দেশ

১। শিবনারায়ণ রায় সম্পাদিত, *জিজ্ঞাসা* (কলকাতা: কার্তিক-পৌষ ১৩৯৩ পৃ. ৩৩৬)

২। নুরুল আনোয়ার, ছফামৃত (ঢাকা: খান এন্ড ব্রাদার্স, ২০১০, পৃ. ৮৩)

৩। আহমদ ছফা, *অলাতচক্র* (ঢাকা: খান এন্ড ব্রাদাস, ২০১৯ পৃ. ১৭)

৪। পূর্বোক্ত পৃ. ৬৬

৫। পূর্বোক্ত
৬। পূর্বোক্ত পৃ. ৮৬
৭। পূর্বোক্ত পৃ. ৯১-৯২
৮। পূর্বোক্ত পৃ. ১০০
৯। পূর্বোক্ত পৃ. ৯৮
১০। পূর্বোক্ত পৃ. ৮৪
১১। পূর্বোক্ত পৃ. ১০৫
১২। পূর্বোক্ত পৃ. ১২৪
১৩। পূর্বোক্ত পৃ. ১৩২
১৪। পূর্বোক্ত পৃ. ১৪৩
১৫। পূর্বোক্ত পৃ. ১৪৪
১৬। পূর্বোক্ত পৃ.৮৫-৮৬
১৭। পূর্বোক্ত পৃ.১৬
১৮। পূর্বোক্ত পৃ. ৪২
১৯। পূর্বোক্ত পৃ. ৯৮
২০। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *আহমদ ছফার পাঁচটি উপন্যাস*, (ভূমিকা) (ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৯৫, পৃ. ০৭)
২১। সলিমুল্লাহ খান, *আহমদ ছফা সঞ্জীবনী* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০১০, পৃ. ২৩৭)
২২। চন্দন আনোয়ার সম্পাদিত *গল্পকথা* (ঢাকা: ফেব্রুয়ারি, ২০১৯, পৃ: ২৮৬)

সহায়ক গ্রন্থ:

১) ছফা, আ. (২০০৬) অলাতচক্র।
২) হাননান, সু. (২০১৭) আহমদ ছফার উপন্যাস, বাংলাদেশের উদ্ভব এবং বিকাশের ব্যকরণ।
৩) হাবিব, র. (২০০৫) বাংলাদেশের কবিতা ও উপন্যাসের দর্শন এবং আহমদ ছফার সৃষ্টি বিশ্ব।
৪) আনোয়ার, নূ. (২০১০) ছফামৃত।
৫) ইলিয়াস, আ. (১৯৯৫) আহমদ ছফার পাঁচটি উপন্যাস।
৬) ছফা, আ. (২০০৪) আহমদ ছফার উপন্যাসসমগ্র।
৭) খান, স. (২০১০) আহমদ ছফা সঞ্জীবনী।
৮) আনোয়ার, চ. (২০১৯) আহমদ ছফা সংখ্যা, গল্পকথা।
৯) হাসান, মো. শ., ও হাসান, সো. (২০০৩) আহমদ ছফা স্মারক গ্রন্থ।
১০) তানজিয়া, গা. (২০১৪) কালের নায়ক।
১১) মামুন, না. আ. (২০০২) আহমদ ছফার সময়।
১২) শামীম, ই. সম্পাদনা, আহমদ ছফা সংখ্যা, লোক (লিটল ম্যাগ)।
১৩) মাজহার, ফরহাদ সম্পাদনা, আহমদ ছফা সংখ্যা, চিহ্ন।